সাধন চট্টোপাধ্যায়ের ‘কোলাজ’

তণকান্তি রায়

এ গারটি গল্পের মূচর্ছনায় গড়ে উঠেছে সাধন চট্টোপধ্যায়ের ‘ কোলাজ’- এক সাঙ্গীতিক ঐকতানের শৈল্পিক অভিপ্রায়।

প্রত্যেকটি গল্পেরই স্বতন্ত্র শিরোনাম আছে, তবে পত্রিকায় প্রকাশের (১৯৯৭) সময় গল্পগুলি ‘ কোলাজ-১’ বা ‘ কোল াজ-২’-- এইরকম সংখ্যা-চিহিত হয়ে একটা সিরিজের আভাস দিয়েছিল, এবং অবশ্যই পাঠককে এর ধারাবাহিক ক্রমের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। বলা বাহুল্য, এঁরা অবশ্যই বাণিজ্যিক পত্রিকার রঙিন গল্পের পাঠক নন। গল্প ও না-গল্পের মধ্যে সমন্বয়ের সেতু খুঁজতে তৎপর সাধনের এক নতুন নিরীক্ষার ফসল হলো ‘ কোলাজ’-এর এই এগারটি গল্প! এ যেন নতুন সাধন চট্টোপাধ্যায়! কনটেন্ট সামান্যই, ফরম নিয়েই নিমগ্ন নিরীক্ষা। এর বেশ কয়েকটি গল্প পড়লে মনে হতে পারে গল্প ভ াঙার (অথবা প্লট ভাঙার) এক নির্মাণখেলায় মেতেছেন লেখক। প্রথম পাঠ, দ্বিতীয়, তৃতীয়, এমনকি পঞ্চম পাঠেও তথ াকথিত বিনির্মাণ-প্রক্রিয়া যেমন টের পাওয়া গেল না, তেমনি অনুভব করা গেল না গল্পত্ব (যেমন একটি চিঠি, জনৈক স ম্পাদককে; পরীবিদ্যা, মাঝরাতের ট্রেন)- বেশ কিছু রচনার। হয়তো প্রথাগত গল্প পড়ার অভ্যাসকেই ঘাড় ঝাঁকিয়ে ধাক্কা দিতে চেয়েছেন লেখক। কমলকুমার, সুবিমল মিশ্র, উদয়ন ঘোষ, এমনকি অমিয়ভূষণ বা দীপেন্দ্রনাথের অনেক গল্পও তো অতীতে আমাদের অভ্যাসে এমন ধাক্কা দিয়েছিল। হালফিল স্বপ্নময় চক্রবর্তী, অভিজিৎ সেন, ভগীরথ মিশ্র, শঙ্কর সেনগুপ্ত, অসিত চক্রবর্তী, আবুল বাশার, রবিশঙ্কর বল, অনিশ্চয় চক্রবর্তী বা মুর্শিদ এ.এম.-এর অনেক গল্প তো কনভেনশনের ব াইরে নতুন আদল গড়ে তুলতে উচচাভিলাষী। কিন্তু লক্ষণীয় যে, ন্যূনতম স্টোরি-এলিমেন্ট বা প্লটের ভগ্নাংশকে একেবারে অস্বীকার করেননি এঁরা কেউই!

সেই ’৯৫ থেকেই, গল্প ও না-গল্পের দ্বন্দ্ব, কোন্‌দিকে যাবেন অথবা এই দ্বন্দ্বের মধ্যে তাঁর অবস্থান কোথায় তা নিশ্চিতভ াবে বুঝে নিতে তৎপর হয়েছেন সাধন চট্টোপাধ্যায়। সন্দর্ভ বা ডিসকোর্সের ধারণা এই দ্বন্দ্বের হাত ধরেই এসেছে। (যদি বলি, তথাকথিত বি-নির্মাণ বা দেরিদা-ভাবনা বাংলা গল্প ও গল্পকারকে খুব বেশি প্রভাবিত করেনি, হয়তো প্রয়োজনও নেই তার; তাহলে খুব অন্যায় হবে না বোধহয়)। যাই হোক, গল্পের কনটেন্ট যে রিয়েলিটি থেকে উঠে আসে, সেই ব াস্তবের দ্বিমাত্রিক বা ত্রিমাত্রিক স্তরকে বোঝা ও ধরার চেষ্টা সাধনের লেখালেখিতে ’৯৫ থেকেই (‘ কোলাজ’-এর গল্পগুলি লেখা হয়েছে ’৯৭-তে)। সাধন নিজে অবশ্য দাবি করেছেন ‘ বেলা অবেলার কুশীলব’ (১৯৯১)-এর পর্বেই তিনি নিজের মধ্যে ভাঙন ও বি-নির্মাণের প্রক্রিয়ার সাক্ষী হয়েছেন--

‘আমার ‘মহারাজ দীর্ঘজীবী হোন’ সংকলনটি প্রকাশের পর থেকে (১৯৮৫), ‘ বেলা অবেলার কুশীলব’ (১৯৯১) পর্যন্ত একটি দুঃসহ শ্রম এবং নিজেকে বি-নির্মাণ করবার রক্তক্ষয়ী পর্ব পার হতে হয়েছিল।’১

১. দ্র. ‘আমার ভাবনা বলে কিছু নেই’। ‘উত্তরাধিকার’ পত্রিকার গল্প ও গল্পকার সংখ্যা। জুলাই-ডিসেম্বর, ১৯৯৬।

নিজেকে বি-নির্মাণ করবার আরও চারবছর পরে, ১৯৯৫-তে এসে, প্রথম ও দ্বিতীয় বাস্তবের সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টায় লিখেছেন--

‘আসল কথা, লেখকের একটি দ্বিতীয় বাস্তব তৈরির লক্ষ্য আছে। সেটাই আসল। প্রথম বাস্তবটি খসে অপ্রয়োজনীয় হয়ে, স্থায়ী আকার লাভ করে এই দ্বিতীয় বাস্তব। সামান্য খড়, কাঠ, কাগজের ওপর কংক্রিট ঢালাইয়ের উপমা মনে পড়ে। ছাদ তৈরি না হলে বা ফুটো থাকলে, খড় কাঠ কাগজের আয়োজনই বৃথা। সুতরাং আপাত লজিকহীনতা বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব

াস্তবতার বাইরের ভূমিতে দাঁড়িয়ে, দ্বিতীয় বাস্তবের একটি ত্রিমাত্রিক রূপ সৃষ্টি করাই, বোধহয়, সমসময়ের গল্পকারদের চেতনায় মুখ্য হয়ে উঠছে।'২

বলাবাহুল্য যে, সাধনের নিজের গল্পও এই প্রচেষ্টার বাইরে নয়।

সমকালীন ও পরবর্তী প্রজন্মের নিরীক্ষা প্রবণ তণ গল্পকারদের প্রসঙ্গে এসব কথা বলার পরে, ' ৯৬-তে যখন নিজের প্রসঙ্গে লিখতে বসেন সাধন, তখন 'ডিসকোর্স' ও 'ন্যারেশন'-এর ভাবনাই তাঁকে আচ্ছন্ন করেছে, যে তাত্ত্বিক কাঠামোর মধ্যে সমালোচকের স্বেচ্ছাচার বা নৈরাজ্যের সমূহ সম্ভাবনা নিহিত সেই ভাবনা সত্তরের এই দায়বদ্ধ প্রবীণ লেখককেও না ড়িয়ে দিয়েছে--

' লেখককে ' লেখকের' মতো বুঝতে পারা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। প্রয়োজনও নেই তার। সন্দর্ভের (অর্থাৎ, ডিসকোর্স-এর) ফলে নতুন সত্য জন্মলাভ করে বলেই সাহিত্য জীবন্ত, ত্রিয়াশীল সফল। আমার সত্য অন্যের উপলব্ধিতে নানা কৌণিক সত্যের জন্ম দিলে বোঝা যাবে সৃষ্টি সার্থক। তাই ধ্রুপদী লেখকেরা যুগে যুগে নতুন বিচারের আলোকে অত্যন্ত জরী হয়ে ওঠেন।'৩

লেখককে লেখকের মতো বোঝার প্রয়োজন নাও থাকতে পারে, কিন্তু এইভাবে বুঝতে পারা বা বোঝাবার চেষ্টা কেন সম্ভব নয় তা নিয়ে প্ন ওঠাই সম্ভব। আমার মতো দ্বন্দ্বজর্জর পাঠক, যাঁরা ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক গতিসূত্রের সঙ্গে একান্ত অ্যাকাডেমিক পাঠাভ্যাসের চর্চাকে সতত মেলাতে চান, তাঁরা তো বলবেই পারেন যে, তাহলে কি বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-প্রেমচন্দ্র-টলস্টয়-গোর্কি-লু শুন সম্পর্কে আমাদের প্রতিদিনের পাঠাভ্যাস বা প্রতীতি ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে?

'৯৬-এর ওই প্রাগুক্ত লেখাতেই সাধন চট্টোপাধ্যায় অবশ্য গল্পে প্লট, শব্দ বা ভাষাবৈভবের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নিয়েছেন। তাঁর বিবেচনায়, 'ডিসকোর্স' গড়ে ওঠার পথে এরা কোনো প্রতিবন্ধক নয়, বরং অপরিবর্তনীয় ধ্রুবক। কিন্তু পরিবর্তনীয় ধ্রুবক হলো--

' লেখকের বোধ-- যেখানে অন্বিত থাকে সমাজ, সময়, অর্থনীতি, ইতিহাস, দর্শন ও রাজনৈতিক জ্ঞানের পরম্পরা ও অন্তঃসম্পর্ক। এই দুই ধ্রুবকের সমন্বয়ে যে পাঠ লেখক সৃষ্টি করেন, তা পাঠকের চৈতন্যে সন্দর্ভ ঘটিয়ে বি-নির্মাণ ঘটায়। তাহলে আমার গল্পভাবনার মধ্য দিয়ে পাঠকের ভাবনার সন্দর্ভ যে নতুন সত্যের জন্ম দেয়, আমিও তা থেকে উপকৃত হব। অর্থাৎ আমার চৈতন্য নতুন উদ্দীপনা পাবে।'

সেই উদ্দীপনাই হয়তো ' কোলাজ' নির্মাণের উৎস! সাধনের সৌভাগ্য যে, পাঠকের তথাকথিত বি-নির্মাণ তাঁকে পথভ্রান্তির বিপন্নতায় দিশাহারা করেনি। অথচ এই বি-নির্মাণ প্রক্রিয়ায় যে ব্যাপক নৈরাজ্য ও স্বেচ্ছাচারের সুযোগ আছে তা লেখককে ভুল বোঝা ও বোঝানোর পক্ষে যথেষ্ট; তাই '৯৭-এর ' কোলাজ' একাদশ পাঠকদের তাৎক্ষণিক

২. দ্র. 'সমসময়ের ছোটগল্প এবং কোয়ান্টা'/' কোরক' সাহিত্যপত্রিকার ছোটগল্প সংখ্যা, শারদীয়া ১৪০২।

৩. দ্র. 'আমার ভাবনা বলে কিছু নেই'/উত্তরাধিকার' পত্রিকার জুলাই-ডিসেম্বর সংখ্যা, ১৯৯৬।

অভিনন্দনে ধন্য হয়ে আজ সাধন চট্টোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যের ধারাবাহিকতায় একটি অবশ্যপাঠ্য মাইলস্টোন! কেননা, ' কোলাজ'-এর নিবিষ্ট পাঠ না নিলে বোঝা যাবে না কেন তিনি 'মাটির অ্যান্টেনা', 'বিন্দু থেকে বৃত্ত', বা 'জলতিমির' উপন্যাসে নতুন ধরনের কথনভাষা, আখ্যানের 'ডিসকোর্স' বেছে নিতে চেয়েছেন। আরও পরে, ২০০১-এর এক আলোচনাচক্রের বক্তৃতায় স্পষ্টভাবে বলেছেন কাহিনী ও না-কাহিনীকে মেলানোই তাঁর সাম্প্রতিক গল্পচর্চার অভিপ্রায়। অবশ্যই এ এক ফর্মের খেলা, হয়তো ভাঙতে ভাঙতে গড়ার যে সাধনাতাঁকে আবিষ্ট করেছে তার চূড়ান্ত বিচার করবে আগামীকাল। কিন্তু প্রশ্ন না জেগে পারে না যে, ইন্ডিজেনাস বা রাষ্ট্র-সমাজ ও সময়ের অন্তর্স্বরকে, সিভিল সোসাইটি ও তার ওপর দাঁড়িয়ে থাকা মানুষজনের ক্রমপরিবর্তমান দ্বিমাত্রিক বাস্তবকে ধরার জন্য কেন এত নিবিড়ভাবে ফর্ম-সচেতন হতে হবে? কাহিনী ও না-কাহিনীর বলয়কে বা তার মধ্যবর্তী অন্বয়-বিন্দুকে খুঁজতে হবে আতস কাঁচ দিয়ে? বুর্জোয়া সিস্টেমে সাধারণের জীবনে কোনো নতুন নেই, কোনো গল্প নেই তাই সাহিত্যের গল্পেও গল্প থাকবে না, ছুঁড়ে ফ্যালো গল্পকে-- এমন সোচ্চার বিদ্রোহ তো ছয়ের দশকে প্রভূত শোরগোলতুলে আজ পরিত্যক্ত! ভয় হয়, আজকের না-গল্প বা না-কাহিনীর আন্দোলনের একই পরিণতি হবে না তো? কারণ, এমনিতেই ইলেকট্রনিক মিডিয়া সীরিয়স সাহিত্যের পাঠক বসিয়ে দিয়েছে দাণভাবে, তার ওপর বাঘাতিন-গ্রামসি-দেরিদা-ফুকো-র ওজনদার তত্ত্বের ব্যাখ্যা, ইন্ডিজেনাস-কোয়ান্টা-ডিসকোর্স-

সিনক্রোনিক-ডায়াক্রোনিকের কঠিনতম পাঁচিল টপকে লেখকের কাছে পৌঁছতে চাওয়ার মতো নিষ্ঠাবান পাঠক এখন আর কতজন? বলতে সঙ্কোচ হয়, অথচ ভীষণ জরি সত্য এই যে, সহজ হওয়াই ভীষণ কঠিন! যে-ভরসায় সাধনরা পাঠকের বি-নির্মাণ ক্ষমতার ওপর তাঁদের ডিসকোর্সকে ছেড়ে দিচ্ছেন, সেই অগাধ আস্থা যদি একদিন প্রতারিত হয় তাহলে কিছু বল ার থাকবে না।

তবে, সুখের কথা, তাত্ত্বিক অনুসন্ধিৎসার প্রবন্ধে বা স্বগতকথনের গদ্যে যা-ই বলুন না কেন সাধন, শেষপর্যন্ত গল্প বা কা হিনীর কাছেই তিনি দায়বদ্ধ থাকতে চেয়েছেন-- 'মাটির অ্যান্টেনা' 'জলতিমির' বা 'পাল্টিপুরাণ' শেষপর্যন্ত কাহিনী-নির্ভর উপন্যাসই হয়েছে, যতই তার কথনভঙ্গির মাঝখানে এক অমোঘ ট্রানজিশন ফেজ!

' কোলাজ' বইটির গোড়ায় খুব স্পষ্টভাবে লেখক জানিয়েছেন এই নতুন রীতির গল্পমালায় তাঁর শৈল্পিক অভিপ্রায়ের কথ া--

'ভাষা ও কাহিনীবিন্যাস-- উভয়কে সমতলে রেখে, পারস্পরিক সম্পর্কের নানা ছাঁচে ছোট-গল্পের ঐতিহ্য। কিন্তু বিন্য াসটিকে যদি টুকরো-টুকরো ভেঙে বিভিন্ন তলে ছড়িয়ে দেওয়া যায়? ভাষা যদি জাঁকজমক সরিয়ে নিজেকে আয়োজনহীন অথচ বেশি স্বচ্ছ করে তোলে? একটি অখন্ড ভাবপ্রকাশের খেলায়? এই পরীক্ষাতেই ১৯৯৭-এর শারদীয়াগুলিতে.... 'কে ালাজ' নামে প্রায় এক ডজন গল্প লিখেছিলাম।'

প্রথাগত এই বিন্যাস-কৌশলকে ভেঙে ছড়িয়ে দিয়েও ভাবপ্রবাহকে অখন্ড রাখাটাই লেখকের শৈল্পিক পরীক্ষার অভিপ্র ায়-- গল্প বুনে চলা নয়। হয়তো গল্পবয়নের শৈল্পিক তাগিদ লেখকের কাছে অনেক আগেই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেছে। বলতে পারি, ভাঙনের পথ ধরে এ'এক নির্মাণখেলা! একেই কি তিনি এইবাবে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন--

'আমি আখ্যান বলতে বুঝি কাহিনী ও না-কাহিনীর দুই বিপরীতমুখীন সহাবস্থান।..... প্লট বলতে বোঝায় কাহিনীর বিন্য াসকরণ।... আসলে আখ্যান হচ্ছে কাহিনী ও না-কাহিনীর সমীকরণ।... না-প্লটের মধ্যেই এ-শহরের বিস্তার লুকিয়ে অ াছে। আমরা সময়কে ভাঙতে দেখেছি, টুকরো-টুকরো, গ্রন্থিনী অস্তিত্বে উঠে আসতে দেখছি, টুকরো হওয়ার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে আমরা চেষ্টা করেছি, আমাদের জৈব-সময়ের ফ্রেম থেকে বেরিয়ে বিপুল বিশাল একটি সময়ের সঙ্গে একে যুক্ত করায়।'৪

'কোলাজ'-এর এগারটি গল্পে যে ভাষা ও কাহিনীবিন্যাসের সমতলিক বহুপ্রসিদ্ধ বিন্যাসকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন এক শৈল্পিক নিরীক্ষার অভিপ্রায়-- তাতো আসলে প্রচলিত প্লটবিন্যাসকে প্রত্যাখ্যান ক'রে ন া-প্লটকেই বিস্তার দেবার অভিপ্রায়। অথচ কোথাও গল্পত্বের বিদ্ধে সোচ্চার বিদ্রোহ নেই। কিন্তু 'কোলাজ'- এর আটটি গদ্য আমাদের প্রচলিত অভ্যাসে বড়সড় ধাক্কা দেয়।

যেমন, 'তৃণভূমি' গল্পটির কথাই ধরা যাক। এর কথনরীতির আপাত নিস্পৃহতার সঙ্গে পরবর্তী উপন্যাস 'মাটির অ্যান্টেন া'র কথনরীতির কী অদ্ভুত সাদৃশ্য! ভাষা ও কাহিনীবিন্যাস-- এই দু'য়ের প্রথাগত সমতলিক বিন্যাসকে টুকরো টুকরো করে ছড়িয়ে দিয়ে না-প্লটের দিকেই বেশি ঝুঁকেছেন সাধন, ফলে স্টোরি-এলিমেন্ট প্রায় নেই বললেই চলে। অথচ এ' এক নতুনরীতির গল্প হয়ে উঠতে চেয়েছে। 'তৃণভূমি' তে অনেকগুলি চরিত্র, তাদের সামাজিক অবস্থান ও জীবিকা বিচিত্র ধরনের; একটানা কথনের ফলে তাদের সকলের কথাই অল্পবিস্তর শোনা যাচ্ছে-- তার জন্যে পৃথক স্পেস বা প্যারাগ্র াফের অবকাশ খুঁজতে হয়নি। কোনো গল্প নেই, একটি দিন কয়েকটি মুহূর্ত তৃণভূমিতে যাপনকালীন বিক্ষিপ্ত কয়েকটি আপ াত যোগসূত্রহীন ঘটনা (তবে, পুরো ইল্লজিকাল নয়; অবশ্য এ প্রা অবান্তর কারণ প্লটকেই যখন ভাঙতে চাইছেন তিনি তখন লজিকের দাবি গৌণ হয়ে যায়) এবং মাঝে মাঝে অতীত ও বর্তমানকে পারস্পর্যের বিন্যাস সরিয়ে একত্রে মিশিয়ে দেওয়া অথবা সচেতন বিপর্যয় ঘটানো। গল্প নেই, তবু চরিত্র আছে কয়েকটি। তার মধ্যে প্রধান চরিত্র অবশ্যই নির্মলেন্দু-- তারই দৃষ্টিকোণ ও পর্যবেক্ষণ থেকে 'তৃণভূমি' না গল্প হয়ে উঠতে চেয়েছে; কিন্তু এ আখ্যান নির্মলেন্দুর একার গল্প নয়। ফর্মের নতুন ভাঙনের উন্মাদনায় সাধন যখন বিশ্বাস করতে শু করেছেন একালের আখ্যানে পাঠক আর লেখকের একক কণ্ঠস্বর শুনতে নারাজ; তাই 'তৃণভূমি'তে যাদের পদচারণা তারা সবাই অল্পবিস্তর কথা বলছে-- কেউ অতীতে কেউ বা সা ম্প্রতিক। এবং এইভাবে সময়ের

৪. দ্র. 'আখ্যান কাহিনী ও না-কাহিনীর সমীকরণ'/ বাংলা কথাসাহিত্য/চতুর্দশ উজ্জীবনী পাঠমালা/ জ্যোর্তিময় ঘোষ ও

সনৎকুমার নস্কর কর্তৃক সম্পাদিত। বাংলা বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত।
নানা স্তরকে ভেঙে ভেঙে টুকরো টুকরো স্পেস-এর মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে আখ্যানের বহু স্বরকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন সাধন। আখ্যানেরই বহুস্বর; যুগ যুগ ধরে যেহেতু এই বহুস্বরিকতা নানা মাত্রায় নানা পর্দায় নানা স্তরে বিভক্ত হয়ে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে আসছে, তাই বিন্দু বিন্দু ভাঙা সময়ের নির্যাস তার পাশে নিথর হয়ে সাময়িকভাবে দাঁড়িয়ে থাকলেও; এবং এই বহুস্বরের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম ও প্রচ্ছন্ন সাঙ্গীতিক ঐকতান গড়ে তোলার চেষ্টায় লেখক প্রভূত পরিমাণে যত্নবান বলেই আমাদের প্রথাগত পাঠাভ্যাসে বড়সড় ধাক্কা দিতে পেরেছেন। তবে, বলতে সঙ্কোচ হচ্ছে, চতুর্থবার পাঠগ্রহণের পরেও আমার মতো নির্বোধ নিরেট অ্যাকাডেমিক পাঠকের মননে তথাকথিত বি-নির্মাণ প্রক্রিয়া কোনো গল্প বা গল্প-প্রতীতি গড়ে তুলতে পারেনি। বরং একে প্রথাসিদ্ধ গোলগোল সুখান্তক গল্পের বিদ্ধে এক নিরীক্ষাশীল শৈল্পিক প্রতিবাদ হিসেবেই গ্রহণ করেতে আগ্রহী হয় এই পাঠকের বেয়াড়া পাঠ্যাভ্যাস। ভাঙনের ঔদ্ধত্য এখানে খুব তীব্র হয়েও আশ্চর্য নৈপুণ্যে সংযত, কিন্তু নির্মাণের উল্লাস কোথায়?
একটু ভেতরে ঢোকা যাক। একমাস পরে নির্মলেন্দু সারারাতের প্রায়-অনিদ্রার ক্লান্তি কাটাতে বেছে নিয়েছেন বাড়ির নিকটবর্তী তৃণভূমিকে। গল্পের শুতেই সময়ের একটা সূক্ষ্ম ব্যবধান জানিয়ে রাখা হলো যাতে সহজেই তুলনামূলক অভিমতের ন্যারেশনে 'টাইম' ও 'স্পেস' নামক অপিরিবর্তনীয় ধারণাটিকে বারবার ভেঙে দেওয়া যায়। প্রারম্ভ-বাক্যে একমাস আগের অভিমতের সংক্ষিপ্ত উল্লেখটুকু জানিয়েই বর্তমানকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে প্রথম প্যারায়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্যারায় অদূর অতীতের পর্যবেক্ষণ, তার ঘ্রাণ এখনও এত টাটকা যে মাঝে মাঝে ভুল হয় বুঝি এখনকার কথাই বলছেন লেখক। ভুল ভাঙবে 'পেয়েছিলেন' বা 'করেছিলেন'-এর মতো সকর্মক অতীত ক্রিয়াপদের ব্যবহার দেখে। আবার, দ্বিতীয় প্যারার দ্বিতীয় বাক্যে একমাস আগের অতীতে স্থিত অভিমতো টাইম ও স্পেস-এর সব বেড়া ভেঙে কেমনভাবে যেন চিরকালের সত্য হয়ে ওঠে--
'নির্মলেন্দু তো বাল্যজীবনে কত পেটানি খেয়েছিল কাশে এইসব তথ্য শিখিবার জন্য।'
কিন্তু তারপরেই, আবার, প্রথম প্যারার মতো সমকালের (একমাস আগের অতীতও ধরতে চেয়ে জটিল ও বহুমাত্রিক হয়ে উঠতে চায় ন্যারেটরের গদ্য, তা অনেকার্থক সিদ্ধির অভিপ্রায় স্থিরলক্ষ্যগামী, কিন্তু চলনটি ঈষৎ বক্র--
'কিন্তু সেই ভোর, আলো ছড়িয়ে পড়বার প্রতীক্ষায় চারপাশ যখন কোন ম্যাজিশিয়ানের পথ চেয়ে, নির্মলেন্দু দেখতে পেয়েছিলেন ওপাড়ার মানুষজন-- যারা মাঠ পেরিয়ে পিচ রাস্তায় ওঠে, চলার চিহ্নে যে পথ, যাকে বলা হয় ছিলে পড়ে যাওয়া-- কর্ণাটিকে অক্ষ বানিয়ে কখনও ডানে, বাঁয়ে, কখনও কাৎ হয়ে, কিছুনা যেন ছিটকে কান্নিক খেতে-খেতে, এই পর্যন্ত চলে আসে।'
অথবা--
'ক্রমে, সেদিন তিনি নদী, ঘোড়সওয়ার কিংবা ছায়াপথ-- কি কি দেখতে পেয়েছিলেন ওই মাঠ-ঘাস-কর্ণ-ছিলে পথ উধাও হারিয়ে গেলে, গত ১ মাস পর আজ আর স্মরণে নেই।'
অনেকগুলি বাক্যাংশ, অনেকবার স্বরের ওঠা-পড়া; বহুকৌণিক পর্যবেক্ষণ; আর এসবের সমবায়ে একটি সিনট্যাকটিক ফ্রেম সযত্নে গড়ে তোলা ও তার মধ্যেই সময়ের স্তরকে ইচ্ছামতো ভেঙে দিয়ে এক ধরনের সচেতন বিপর্যয় ঘটানো, (মনে পড়ছে গৌরকিশোর ঘোষও অতীতে 'কমলা কেমন আছে' ও 'প্রতিবেশী' উপন্যাসে সময় নিয়ে এইরকম ভাঙনের বিপর্যয় গড়তে চেয়েছিলেন)-- এইভাবেই মাঠ, তার কোণাকুণি হাঁটাপথে, নদী ইত্যাদি আখ্যানের বিষয়ীভূত হয়ে যায় নির্মলেন্দুর স্মৃতিচারণের দর্পণে। আখ্যানের নাম যখন 'তৃণভূমি', তখন মাঠই কেন্দ্রস্থ গোলক হয়ে থাকবে সমগ্র আখ্যান জুড়ে এবং না-প্লটের যাদুকরী শোষণ-ক্ষতমায় অনেক আপাততুচ্ছ ডিটেলকে তার মধ্যে আত্মস্থ করে নেবে-- এমন প্রত্যাশা আর হয়ে-ওঠা বিনির্মাণের স্তরে থাকে না, বরং প্রত্যাশার ছিলাপথেই পাঠক এগোতে থাকেন ন্যারেটরের হাত ধরে। ন্যারেটর এখানে একই সঙ্গে নির্মলেন্দু এবং সাধন চট্টোপাধ্যায় দু'জনেই। এরপরে তৃণভূমি-সংলগ্ন অনেকগুলি চরিত্র একই সঙ্গে অথবা আলাদা আলাদা ভাবে গড়ে তোলে কয়েকটি টুকরো না-কাহিনীর ফ্রেম, যা শুধুমাত্র মুহূর্তের বিন্দুতেই স্থির লগ্ন হয়ে থাকে তাদের অতীত অভিমতের নির্যাস ও অনাগত ভবিষ্যতের স্বপ্ন নিয়ে। ফ্রেমগুলি এইরকম--
১. কুকুরদের সমবেত নিঃশব্দ উপস্থিতি, মাঠের দুই প্রান্তে তাদের সামাজিক অবস্থানের মেকরণ এবং এই সূত্রে মহাভ

ারতীয় মিথ্-এর উল্লেখ। লক্ষ্যণীয়, কুকুরদের প্রতি দৃষ্টিপাতে ন্যারেটর হঠাৎ 'নির্মলেন্দুবাবু' হয়ে গেছেন।
২. একটি হৃদরোগগ্রস্ত কন্যাকে নিয়ে তার উদ্বিগ্না মায়ের ভোরের তাজা বাতাস প্রাণভরে সংগ্রহ করার জন্য বৃত্তাকার পরিক্রমা। শ্রান্ত মেয়েটি পড়ে গেলেও মায়ের হুঁশ ফেরে না।
৩. এক বৃদ্ধা ও তার গর্ভবতী পুত্রবধূর স্বাস্থ্যোদ্ধারের ক্লান্ত প্রয়াস। তাদের একপাটি চটি কুকুরের ছিনতাই করা নিয়ে মুহূর্তের টুকরো হিউমার-ফ্রেম।
৪. কিছু কিশোরের ক্রিকেট খেলা, তার মধ্যে পল্টু নামের ক্যাচ-ফসকানো ছেলেটির জন্টি রোডস্ হতে চাওয়ার আকাঙ্খায় দর্পণে তার অক্ষম প্রতিবেশের ছায়া।
৫. তিন মহিলার একান্ত মেয়েলি সুখদুঃখের পাঁচালি।
৬. অ্যালসেশিয়ানের চেন-ধরা এক বায়ুসেবীর খেজুরে কৌতূহল, এখানে ডিসকোর্স উঠতে চাইছে সরাসরি নির্মলেন্দুর সঙ্গে ইন্টার-অ্যাকশনের মাধ্যমে।
৭. নান্দু ও ব্রজদা-র পারস্পরিক জীবিকা-কেন্দ্রিক একান্ত ধান্দার ভাষায় কথোপকথন।
৮. ফেরার পথে একজোড়া নির্ভীক প্রেমিক-প্রেমিকার সতেজ স্বতঃস্ফূর্ত নিশ্বাস।
৯. রোগজীর্ণ, অনতিবৃদ্ধ তিন বায়ুভুক মানুষের স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত উদ্বেগ।
এইসব সিচ্যুয়েশন যে পরপর ঘটে গেছে, এমন নয়। যেমন, প্রথম উল্লেখের পর পল্টুর স্বপ্নের ক্যাচ ধরার প্রসঙ্গ দ্বিতীয় বাস্তবে এসেছে চারটি সিচুয়েশনের পর। বহুস্বারিকতার চরিত্র মেনে 'টাইম' ও 'স্পেস'-এর ধারাবাহিক লজিকাল ক্রস-এর বিপর্যয় ঘটিয়ে, লেখকের কথামতো ভাষা ও কাহিনীর সমতলিক বিন্যাসকে টুকরো টুকরো করে ভেঙে বিভিন্ন তলে ছড়িয়ে দিয়ে, অনেক না-কাহিনীর সমবায়ে একটি কাঙ্খিত গল্পের সাঙ্গীতিক আবহকে গড়ে তুলতে আগ্রহী হয়েছেন লেখক। অনেক বিভিন্নমুখী তানের ও রাগের সমবায়ে যেন একটি বিচিত্র কনসার্ট। 'তৃণভূমি' যে এত ভাঙনের নিরীক্ষা-স্তর পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত গল্প হয়ে উঠতে চেয়েছে তার প্রমাণ এর শেষাংশ, যখন এক পশলা বৃষ্টির পর প্রায়-পরিত্যক্ত মাঠটি পুনরায় পরিক্রমায় গেছেন নির্মলেন্দু এবং দেখেছেন তার আমূল পরিবর্তিত চেহারা। সময়ের অনেকটা স্তর পেরিয়ে এসে দেখলেন তৃণভূমিতে অনেকগুলি ইচ্ছাপূরণের উপকরণ টুপটাপ খসে পড়েছে 'টাইম' ও 'স্পেস'-এর মধ্যবর্তী ফাঁক গলে, হয়তো না-কাহিনীর আকাশ থেকেই। এখানেই যেন, কিছুটা জাদু বাস্তবের ছোঁয়ায়, তৃণভূমির বহুস্বর এক কেন্দ্রীভূত ঐকতানে গল্পের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছে। জাদুবাস্তবই তো, না হলে কীভাবে পরপর ঘটে এইরকম আখ্যানের চরিত্রগুলির অচরিতার্থ স্বপ্নসাধের সিদ্ধি? যেমন--
১. 'হঠাৎ চমকে উঠলেন, আকাশের শূন্যতা ফুঁড়ে হলুদ বলটি ধপ করে মাঠের ঘাসে ক্যাচ্ হয়ে পড়ল-- অথচ পল্টু নেই।' (সকালে পল্টুর স্বপ্নের ক্যাচটি আকাশেই লুকিয়ে পড়েছিল।)
২. 'চলার মধ্যেই এককোণে নজর গেল, সতেজ একটি পাঞ্জা-- কত বছর আগে হারিয়ে যাওয়া। নান্দু কোথায়?' (কলালে নান্দুর-র পরিচয়-প্রসঙ্গে আমরা জেনেছি-- 'যৌবনে ডাকাতি করতে গিয়ে বোমে ডানহাতের পাঞ্জাটি উড়ে গেছে।.... এত বছরের শেষে একটা কিছু হারাবার বেদনা যায়নি। প্রতিদিন পুকুরে ডুব দিয়ে তৃণভূমির ঘাসের পথে মাথা নিচু করে এমনভাবে হেঁটে আসে যেন পাঞ্জাটা এই মাঠেরই কোথাও হারিয়ে গেছে বহুদিন আগে, হঠাৎ খুঁজে পেলে পরে নেবে।')
৩. 'কী মনে হতে, আশর্চ্য ভাবটুকু নিয়েই এ প্রান্তে দেখলেন একজোড়া অক্ষত, হাওয়াই চটি। ঘাসের ওপর চুপচাপ সাজানো, মালিকহীন। জুতোজোড়ার চারপাশে ঘিরে সকালের না-পাওয়া ব্যথার কিছু ধুলো জমা।'
(বলা বাহুল্য, এই হাওয়াই চটি সকালের সেই পোয়াতি বউটির যার চটি হারানো নিয়ে মুহূর্তের হিউমার ফ্রেম গড়ে উঠেছিল)।
৪. 'নির্মলেন্দু এবার আরও খানিকটা শোকসঙ্গীদের মধ্যে হেঁটে চমকে উঠলেন, খুঁতো হৃৎপিন্ডের শিশুটি হঠাৎ ঘাস থেকে উঠেনথ পায়ে ভয়ে ভয়ে কাল্পনিক সীমারেখায় পাক খাওয়ার চেষ্টা করছে অথচ কাউকে খুঁজে পাচ্ছে না বলে গুমরে কান্না। বহুদূরে সেই ঘুনঘুনে কান্নার আওয়াজ ডানা মেলে চলে গেল।'
(সকালে এই বিক্ষত হৃদয়ের শিশুটি মায়ের বৃত্তে ঘুরপাক খেতে খেতে শ্রান্ত হয়ে মাঠের মাঝখানে পড়ে গিয়েছিল সংজ্ঞাহীন হয়ে, হয়তো বা মরেই গিয়েছিল, মা তাকে ফিরেও দ্যাখেনি)।

'তৃণভূমি'-র শেষাংশে এইরকম প্রথম বাস্তব দ্বিতীয় বাস্তব পরস্পর মিশে গিয়ে এক ত্রিমাত্রিক বাস্তবের আভাস তৈরি করে, তৃণভূমি ও তার ওপর দাঁড়িয়ে-থাকা নির্মলেন্দুকে কেন্দ্রে রেখে সুদূর অতীত, হতে-চাওয়া অনাগত ভবিষ্যৎ, মায়াবী জ াদুবাস্তব ও বর্তমানের সমতলিক তাৎক্ষণিক বিন্যাস মিলে মিশে গিয়ে একটি বহুধাবিকীর্ণ গল্পের আদল গড়ে তুলতে চায় যার কেন্দ্র থাকলেও পরিধি সর্বত্রগামী, ব্যাসকূট থাকলেও ব্যাসার্দ্ধ অনেকটাই প্রসারিত--
'নির্মনেন্দু তখন ওদিকটায় ঘুরে, ভাঙা পুরনো ঘাটলার পাশ দিয়ে পায়চারি করতে গিয়ে দেখেন, সকালের বৃদ্ধের দল চলে গেলেও টুপটাপ ছড়িয়ে থাকা কাঠচাঁপার মতো সৃষ্টির কিছু চিহ্ন। ওদের আলোচনার বিষয়গুলো কি প্রাণ পেয়ে গেছে? নির্মলেন্দু যখন চিহ্নগুলো দেখতে দেখতে আত্মগত ভাবনায় নিজেকে ভ্রুণে রূপান্তরিত করলেন, আকাশের কোণে একটি তারা দেখা গেল। পৃথিবীর সঙ্গে বিশাল ব্যবধানের ফারাক নির্মলেন্দুকে ফের একজন পরিণত বৃদ্ধে ফিরিয়ে দিতে, কেমন ভয়-ভয় লাগল।'
'তৃণভূমি'-র উপসংহার যে কোনো পরিণত সুসম্বদ্ধ শিল্পসার্থক গল্পেরই রসপ্রতীতি এনে দিতে চায়, এই প্রতীতির দ্বি-স্তর ব্যঞ্জনা-- (ক) নির্মলেন্দুর উপলব্ধিতে শাশ্বত মানুষের জীবন-পথ পরিক্রমার অনুরণন, (খ) কুকুরের নিঃশব্দ সামীপ্যে মহাভ ারতীয় মিথ্-এর সংলগ্নতায় যুধিষ্ঠির-কল্প অবস্থানে নিজেকে দেখা নির্মলেন্দুর, যেখানে পৌঁছতে হলে অনেক কি ছু ত্যাগ করতে হবে; আসলে মহাপ্রস্থানের পুরাণ-কল্প ভাবনায় মৃত্যুভীতির ভ্রূকুটি। এইরকম উপলব্ধির প্রান্তসীমায় লগ্ন হয়ে নির্মলেন্দু দেখেন অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের মেশামেশিতে তাঁর কাছে 'বিন্দু বিন্দু সময় পাশাপাশি স্থির হয়ে রইল।' এক ানেই 'তৃণভূমি' তার যাবতীয় তাৎক্ষণিকতা ও খণ্ডীভবনের সীমা ছাপিয়ে চিরকালের গল্প হয়ে উঠতে চেয়েছে। এই নির্মলেন্দুর মধ্যে যখন-তখন যে-কেউ সেঁধিয়ে যেতে পারে-- আমি, আমরা, পাঠক আপনি, আপনাদের কেউ, অথবা স াধন চট্টোপাধ্যায় স্বয়ং। স্টোরি-এলিমেন্ট সামান্যই, নিরীক্ষাশীল প্রয়োগের কুশলী চাতুর্যে তাই-ই অসাধারণ তাৎপর্যে ল গ্ন হতে পেরেছে; তার ওপর এ'গল্পের বড় সম্পদ হলো এর গদ্য। এই বহুগামী, বিকীর্ণ, অথচ তিরতির করে ব'য়ে-যাওয়া গদ্যনদী জানিয়ে দিচ্ছে ভাঙনের নির্মাণখোলায় মগ্ন এ এক অন্য সাধন-- নতুন সাধন চট্টোপাধ্যায়, যিনি ন্যারেটারের নতুন কলম নিয়ে দেখা দেবেন 'মাটির অ্যান্টেনা' বা 'বিন্দু থেকে বৃত্ত'-এ।
'তৃণভূমি' আমাদের আলোচনায় এতটা জায়গা নিল কারণ 'কোলাজ'-এর এগারটি গদ্যের মধ্যে এটিই শ্রেষ্ঠতম! লেখকের শৈল্পিক অভিপ্রায়, তা নিয়ে আমাদের যতই ভিন্নমত থাকুক না কেন, এই একটি গল্পই পরিপূর্ণরূপে আত্মস্থ করে নিয়ে সিদ্ধির আকাশ দেখতে চেয়েছে। 'তৃণভূমি'-র শেষাংশে যেমন জাদুবাস্তবের ছোঁয়া, 'কান্নাদানশিবির'-এও ঠিক তেমনি। আগাগোড়া ব্যঙ্গের ফ্রেমে গড়া এ'গল্পে বরং স্টোরি এলিমেন্ট অনেক সংহত, সম্বন্ধ; ভাঙতে চেয়েও নিজের অজ ান্তে লেখক কেন্দ্রস্থ থাকতেই ভালোবেসেছেন, পরিধিকে সামান্য ছাড়িয়ে দিয়েও যথাসময়ে গুটিয়ে এনেছেন সেন্ট্রাল মো টিফের চারপাশে; ফলে একটি কাঙ্খিত বৃত্ত হওয়া না-হওয়ার দ্বন্দ্ব উত্তীর্ণ হয়ে শিবানী মৌলিকের চারপাশে পরিক্রমা করে। চরিত্র ও কাহিনীবিন্যাসকে এখানে সমতলেই রেখেছেন, যদিও সমতলেই ভেঙে ভেঙে টুকরো করে ছড়িয়ে দেবার অভিপ্রায়; তবুও টুকরোগুলি একই কেন্দ্রভূমির লজিকাল সুতোয় কখন যেন গাঁথা হয়ে যায়; খুব বেশি ইল্‌লজিকাল পথে হাঁটেননি লেখক এ'গল্পে; তাই শিবানী-কেন্দ্রিক টুকরোগুলি জোড়া লেগে লেগে শিবানীকেই গড়ে তোলে স্পষ্টতর উজ্জ্বলতার রূপে-- এ'গল্প তাই শিবানীর গল্প। আখ্যানের বহুস্বরিকতার আমেজ থাকলেও তাতে কোনো কনসার্ট বা জে ারালো ঐকতান সৃষ্টি হয়নি, শেষাংশে শিবানীর ইচ্ছাপূরণ জাদু বাস্তবে শেষ পর্যন্ত শিবানীরই কণ্ঠস্বর সবাইকে ছাপিয়ে উঠেছে। 'কান্নাদানশিবির'-- নামকরণের এই স্যাটায়ারের মধ্যেই পাঠকের একটা প্রত্যাশা জেগে ওঠে; ফলে গল্পের অগ্রগতি পাঠককে কোনো বি-নির্মাণের পথে ঠেলে দেয় না; মনে হয় না শিবানীর যাবতীয় কথাবার্তা, তার স্বপ্ন-আকাঙ্খ ার আদল আসলে একটা ডিসকোর্স, মনে হয় না লেখক না-কাহিনী গড়ে তোলার অভিপ্রায়ে সাধনামগ্ন। কলকাতা ৱিবিদ্যালয়ের চতুর্দশ উজ্জীবনী বক্তৃতামালায় না-কাহিনী বা না-প্লটের যে অসামান্য শোষণশক্তির কথা বলেছিলেন সাধন, তা 'তৃণভূমি', 'পরীবিদ্যা' প্রভৃতি গদ্যের ক্ষেত্রে অনুভব করা গেলেও্ এই 'কান্নাদানশিবির' , 'আলোছায়ার জাফরি' , 'বঙ্কুবিহারীবৃন্দ', 'দূরের ডাক', বা 'প্রতিনিধি' রচনায় তা অনুভব করা গেল না। একটু তুলে দিচ্ছি নতুন সাধন চট্টোপাধ্য ায়ের সে শৈল্পিক কৈফিয়ৎ--
'আখ্যানের মধ্যে প্লট ও না-প্লটের পারস্পরিক টানাপোড়েনে প্রকৃত সাহিত্য যুগে যুগে নতুনভাবে মূল্যায়িত হয়। এই ন

া-প্লটের অসম্ভব শোষণক্ষমতা আছে। আখ্যানের শু ও শেষের মধ্যে এই না-প্লট প্লটকে যেমন জড়িয়ে থাকবে আবার স ম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যানও করবে। এই গ্রহণ ও বর্জনের খেলায় কোথাও সামান্য তারতম্য ঘটলে আখ্যান দুর্বল বা কমশক্তির হয়ে পড়ে। বিশেষ করে ছোটোগল্পের ক্ষেত্রে।'৫

একাধিক নিবিড় পাঠে দেখা গেল দুই বিপরীত কোণ থেকে অন্তত দুটি গল্পে এই তারতম্য বেশব্যাপক-- 'একটি চিঠি, জনৈক সম্পাদককে' এবং 'দূরের ডাক'। প্রথমটিতে না-প্লটের প্রায় সর্বগ্রাসী হাঁ-যে তলিয়ে গেছে প্লটের যাবতীয় হয়ে উঠতে-চাওয়া, আর দ্বিতীয়টিতে লজিকাল সুগোল প্লটই সামান্য নিরীক্ষাপ্রবণ ট্রিটমেন্টে যাবতীয় না-প্লটের সমূহ বিদ্রোহ অনেক অভিপ্রায়কে দূরে সরিয়ে দিয়েছে বেশ খানিকটা। প্লট ও না-প্লটের এই বিপরীত্যের মৈত্রী চমৎকার শিল্পিত চেহারা নিয়েছে (এক্ষেত্রে পাঠকের নিজস্ব বি-নির্মাণের প্র্ন সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক, কারণ বর্তমান পাঠক এই প্রক্রিয়াকে প্রশ্রয় না দিয়েই এমন উপলব্ধিতে অথবা প্রতীতিতে পৌঁছতে পেরেছেন) 'তৃণভূমি', 'পরীবিদ্যা' বা 'বঙ্কুবিহারীবৃন্দ' গল্পে। 'আলোছ ায়ার জাফরি' বা 'ট্রাফিক মাস্টার' ও আদতে গল্পই; যতই তাদের ট্রিটমেন্টে ভাঙনের গর্জন থাকুক না কেন। নির্মাণখেল ায় লেখক এখানে আশ্চর্যভাবে নিজেরই কালাপাহাড়-সত্তার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী! এখানে বলা প্রয়োজন, 'প্রতিনিধি' কোনো তাৎপর্যেই লেখকের শৈল্পিক অভিপ্রায়ের বাহন হতে পারেনি-- সর্ব অর্থেই দুর্বল সৃষ্টি। তবে, এই 'প্রতিনিধি' রচনাতেও অন্য দশটি গদ্যের মতোই, অসমান্য এক বহুগামী অথচ শ্লথ, জটিল বাক্যাশ্রয়ী, বহুমাত্রিক অভিপ্রায়ের সাধক এক নতুন গদ্যের দেখা পাওয়া যায়, যা সর্ব অর্থেই সাধন চট্টোপাধ্যায়ের নতুন শৈল্পিক অর্জন, যে অর্জন তাঁকে উপন্যাস-সন্দর্ভের নতুন মানচিত্রে বিশিষ্ট জায়গা দিয়েছে।

আবার গল্পে ফিরে আসি। দেখা যাক, স্টোরি-এলিমেন্টের সামান্যতা বা অতিস্বল্পতা সত্ত্বেও দু'একটি গদ্য কীভাবে শেষবিচারে গল্প হয়ে উঠতে পেরেছে!

যেমন, 'বঙ্কুবিহারীবৃন্দ'। আগেই বলেছি, এটা পুরোদস্তুর গল্প। ভেবেচিন্তে, পূর্বপরিকল্পনায় সমতলিক ভাষা ও কাহিনীবিন্য াসকে টুকরো টুকরো করে ভেঙে ছড়িয়ে দেওয়া নয়; বরং গল্পই যেন হুড়মুড় করে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চেয়েছে প্রথ াগত প্লটের শর্ত মেনে। না-প্লটের আবহ খুব বেশি নেই। গল্পের বিষয় বারবার অদূর বা সুদূর অতীত ও বর্তমানের মধ্যে পরিক্রমা করেছে, কিন্তু ভবিষ্যতে ছোঁয়ার চেষ্টা তেমন নেই।

৫. দ্র. 'আখ্যান কাহিনী ও না-কাহিনীর সমীকরণ'/'বাংলা কথাসাহিত্য'/চতুর্দশ উজ্জীবনী পাঠমালা/ বাংলাবিভাগ, কলক াতা ঝিবিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত। জ্যোর্তিময় ঘোষ ও সনৎ নস্কর সম্পাদিত।

'বঙ্কুবিহারীবৃন্দ'-- এই নামকরণে বহুত্বের ব্যঞ্জনা থাকায় এ গল্প আমাদের সমকালের এক শাশ্বত দলিল হয়ে থাকে যেখানে ভোগবাদী দুনিয়া ও পুঁজিবাদী অগ্রগতির যুগে একেবারে না-বদলানো জুট মিল শ্রমিক একজন বঙ্কুবিহারীর আপাততুচছ সামাজিক অবস্থানের কাছে রামহরি চক্রবর্তীর (গল্পের কথক) মতো সমাজের পরজীবী অধ্যাপক-শ্রেণীর মানুষরা কোনো এক বিশেষ মুহূর্তে কেমন অপ্রাসঙ্গিক, মর্যাদাহীন, খেলো, বিদ্রূপের পাত্র হয়ে যায়। বিষয়-ভাবনায় নতুনত্ব না থাকলেও পরিবেশন অবশ্যই অসামান্য। এ' গল্পে আমাদের চেনা সাধন চট্টোপাধ্যায়কেই পুরনো ভূমিকায় দেখি, শুধু হাতের কলমটি নতুন। বঙ্কু মারা গেছে এই সাম্প্রতিক বর্তমানের স্পেস থেকে গল্প শু হচ্ছে; প্রারম্ভে-বাক্যের পরেই দ্রুত সুদূর অতীতে, শৈশবে কথকের পর্যটন, সেই অতীত-প্রক্ষেপেই লেখক জানিয়ে রাখতে চাইছেন এই সারসত্য ঠিক সময়ে ঠিক গোলটি করতে পারেনি বঙ্কু, তাই প্রতিপক্ষ "যুগবাণী" জিতে গেছে শৈশবের এ বিফলতার প্রতীকী উল্লেখের পরেই গল্প দ্রুত চলে যায় শৈশবের ক্রীড়াভূমি ছেড়ে ছিন্নমূল মানুষদের হা-অন্ন সংসারে, তির্যক উল্লেখের দ্রুতগামী গদ্য মাত্র একটি ব া দু'টি বাক্যেই এখনকার কথক রামহরি ও বঙ্কুবিহারীর শ্রেণী-সাম্যের পরিচয় পেয়ে যাই আমরা, শ্রেণী-সাম্য,তবে বর্ণস াম্য নয়। এরপরে গড়ে উঠতে থাকে গল্পের আদল-- যা কার্যত এক জোরালো থাপ্পড়, আমাদের মতো কলমপেষা পরজীবী মধ্যবিত্তের গালে! অতীতের টুক রো উল্লেখ ও ভাঙাচোরা বর্তমানের আপাত-অসংলগ্ন ন্যারেশনের সমবায়ে গড়ে ওঠে বঙ্কুবিহারীর অবয়ব, চারপাশের সবকিছু ভোগবাদী মূল্যবোধের দাপটে দ্রুত বদলে গেলেও 'বঙ্কুদের বাড়ির কে ান হেরফের চোখে পড়ে না।' আর বঙ্কুকে দেখলেই ভারতীয় অর্থনীতিতে চটকলের হাল-হকিকৎ টের পাওয়া যায়-- 'এই চারদশকে আদৌ সে চতুর বা আধুনিক হয়ে উঠতে পারেনি।' এই অবক্ষয়ের প্রতিবেশে বঙ্কুর চলিষ্ণু উপস্থিতি যেন এক প্রতিবাদী সদর্থকতা, যে কখনো হেরে যায় না, প্রতিষ্ঠিত বন্ধুকে কুশল জিজ্ঞাসাসূত্রে সবসময়েই বলে 'চলছে ভাই'। কখনে

াই বলে না-- আর চলছে না, আর পারি না! শতাব্দীশেষের প্রহরে, চারপাশের শান-শান্তির স্থিতাবস্থায়, নতুন মূল্যবোধে সবাই নিজেকে যথাসম্ভব বদলে নিচ্ছে, কাঞ্চনমূল্যে স্বীত হয়ে উঠছি আমাদের মতো শিক্ষক-অধ্যাপকরাও; স্বীত হচ্ছি অ ার দ্রুত শিকড়-বিচ্ছিন্ন হয়ে স্থিতাবস্থার প্রবল সমর্থক হয়ে লেখায়-বক্তৃতায়-সভায়-- দলীয় কর্মসূচিতে বদলে দেবার কথ া বলে অদ্ভুত দ্বিচারিতা করে যাচ্ছি; গল্পের কথক রামহরি চক্রবর্তী মতো আমাদের যেন প্রবলভাবে বিদ্রুপ করে বঙ্কু নিজেকে অপরিবর্তিত রেখে গেল, তিনটি ভিন্ন স্পেসে,সময়ে চূর্ণবিপর্যয়ে বঙ্কুর এই অনুসরণীয় অপরিবর্তনীয়তার কথা জা নিয়েছেন যেটা এ'গল্পের হ্যাঁ-প্লটের (না প্লটের প্রবল প্রতিস্পর্ধী সনাতন প্লটকে এইভাবে 'হ্যাঁ-প্লট' বলতে চাই) সেন্ট্রাল মে াটিফ-- এটাই তো এ'গল্পের প্রতিবাদের জোরালো জায়গা--

১. 'এই চার দশকে আদৌ সে চতুর বা আধুনিক হয়ে উঠতে পারেনি। মাঝে মাঝে ভেবেচি, ভাগ্যের জোয়াল কি মানুষকে কি ঘানিতে একভাবে বন্দী করে রাখতে পারে? বদলাবার এত অজস্র পথ ও খুঁজে পায় না? লক্ষ্য করেছি, রাখালের মতো বঙ্কুর স্বভাবেও কিছু ধরে রাখবার প্রবণতা।'

২. 'ওর মিলটা এ-পাড়া থেকে চার মাইলের মতো। গাড়ি-ঘোড়া চলে এমন রাস্তা এড়িয়ে সাইকেলে যেত বলে যাতায় াতে পথটা হয়ে উঠত মাইল দশেকের মতো। বাপেরই পুরনো সাইকেলটা ওর হাতে যেন আরও কিংবদন্তী হয়ে উঠছে।'

৩. '.... সববাই পরিস্থিতির সুযোগে বদলে গেল, পড়ে রইল ঐ পরিবারটি শুধু। রাখাল শীলের (বঙ্কুর বাবা) অদ্ভুত কিছু মূল্যবোধ-- সৎ, সুস্থ বাঁচো-- বঙ্কুও সংরক্ষণ করেছে। লুঠ,তঞ্চকতা, ঠগবাজী বা চোখ উল্টে বিবেক বর্জিত হয়ে নিজেদের বদলায়নি। বঙ্কুকে দেখে বোঝা যেত ভারতীয় অর্থনীতিতে চটকলের হাল কেমন চলছে।'

তিনটি পৃথক স্পেস-এ মূলত সাম্প্রতিক অতীতের ভাঙাচোরাপটে এই যে বঙ্কুর তিনরকম না-বদলানোর উল্লেখ, তাকে একটি অখন্ড অবয়বে জুড়ে নিতে কোনো তথাকথিত বিনির্মাণ-প্রক্রিয়ার দরকার হয় না, প্রথাগত পাঠাভ্যাসের নির্মাণ-প্রক্রিয়াতেই আমরা পেয়ে যাই ভোগবাদী দুনিয়াকে নিচচার ব্যঙ্গে প্রবলভাবে প্রত্যাখ্যান-করা এক ভারতীয় শ্রমিকের ক্রমশ বড় হয়ে-উঠতে-থাকা, সব ক্ষুদ্রত্ব ছাপিয়ে-যাওয়া এক বৃহৎ অবয়ব। অতি-সাধারণের মধ্যে থেকেও এই কারণেই বঙ্কু 'জায়ান্ট', এমনকি কথক-অধ্যাপকের চেয়েও; এই কারণেই তার শোকসভার আয়োজন করে তার বাল্যবন্ধুরা, এবং ওই একই কারণে নামডাকওয়ালা বক্তা (গল্পের কথক) বঙ্কু প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে খাবি খায় ও প্রায়-অসংলগ্ন কথার অরণ্যে পথ হারায়,তারও ন্যারেশন দু'টি পৃথক স্পেসএ--

'উঠেই গম্ভীরমুখে ওর প্রকৃত নাম বঙ্কিমবিহারী না বঙ্কুবিহারী-- সম্বোধনে টালবাহানা থাকায়, কেমন ছানা কেটে গেল সব।'

এবং অন্যত্র--

'হঠাৎ খেয়াল হল, ভাষণের ভাষা শূন্য হয়ে স্তব্ধ দাঁড়িয়ে আছি। আমার সামনে গুটিকয়েক চোখ আহত বিস্ময়ে উসখুস করছে। কী লজ্জা। অপমান। এভাবে মঞ্চে উঠে খেই হারাইনি।... আজ প্রথম বুঝলাম, ভীষণ এলোমোলো প্রসঙ্গহীন হলে শ্রোতাদের চোখ যেমন ফাঁকা হয়ে যায় সেই ছায়াগুলো আমায় বিদ্ধ করল।.... নিজের কাছে হ্যাটা হয়ে ফিরছি স্মরণসভা থেকে।'

না, গেলে গল্প নয়, ছকের গল্পও নয়; একেবারে নতুন কথনরীতিই, তবু যেন সত্তরের সেই খুব চেনা সাধনকে পেয়ে যাচ্ছি এখানে অতিপরিচিত বিষয়-পর্যবেক্ষণের তীক্ষ্ণতা ও অন্তর্ভেদী দৃষ্টির সমাজবীক্ষাসহ। আবার বলি, না-কাহিনীকে লতায়-পাতায় বেড়ে ওঠার সুযোগ ন্যারেটর এখানে বিশেষ দেননি, ন্যারেশনের পধান্য সত্ত্বেও এ'গল্প আগামাথা বঙ্কুরই গল্প; আখ্যানের বহুস্বরে এখানে মৃদুগুঞ্জন তুলেই থেমে গেছে।

এর বিপরীতে দেখা যেতে পারে 'পরীবিদ্যা'-কে। কণিকার স্বামী দুর্ঘটনায় মারা গেছে। স্বামীর আকস্মিক মৃত্যুজনিত চ াকরিটিই এখন কণিকার সম্বল। যৌবনে অকালবৈধব্যের ঝড়ঝাপটা, সুস্থ স্বাভাবিক বেঁচে থাকার জন্য প্রতিবেশীদের অস্ব স্তিকর ভ্রুকুটিকে উপেক্ষা করা, গায়ে-পড়া প্রেমিকদের খুচরো উপদ্রবকে উপেক্ষা করা, অনেক কৃচ্ছ্রতায় যে ছেলেকে বড় করে তুলল, সেই টিকলু আজ ক্লাস ইলেভেনে উঠেই বাপের মৃত্যুজনিত বদল-চাকরিটির দাবি জানাতে শু করেছে, সেই কণিকার অফিসজীবনে একদিন গুতর অপমানের ঘটনা ঘটে যায় ম্যানেজারের ঘরে ঢোকার পরে। ম্যানেজার টিকলুর চ াকরির দাবি-জানানো চিঠিটি দেখিয়ে পুত্রের 'ডিপ্রেসনের' প্রতি ইঙ্গিত করলে কণিকার ' বেরিয়েই মাথা ঘোরে। তীব্র

অপমান ও ক্ষোভ বিষের যন্ত্রণা নিয়ে ছাইতে থাকে দেহ। এই সন্তানের জন্য সমস্ত আবেগ বিসর্জন দিচ্ছে?'-- এই হলো 'পরীবিদ্যা'র সংক্ষিপ্ততম স্টোরি এলিমেন্ট। একেই ভেঙেচুরে, সমতলিক বিন্যাসটিকে নানা স্তরে নানা ফ্রেমে সাজিয়ে, সময়ের একমাত্রিক ফ্রেমকে বারবার ভেঙে দিয়ে না-কাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার অভিপ্রায়। আগেই বলেছি, কাহিনী ও না-কাহিনীর ট্রাপিজ-ভারসাম্যের খেলায় সুক্ষ্মভাবে এ'গল্পে না-কাহিনীরই জিত; এবং বারবার একটি ফাঁকা স্পেস (বিজ্ঞাপনের হোর্ডিং লাগানোর সূত্রে)-এর আক্ষরিক উল্লেখ মোটিফকে সত্যিই নিরীক্ষারস্তরে নিয়ে যায়। সামনের আকাশের ফাঁকা জায়গার খানিকটা কোনো বিপণনের বিজ্ঞাপনের জন্য বিক্রি হয়ে গেছে, ওই ফাঁকা জায়গায় একটা ফ্রেম গড়ে উঠবে, সেই ফ্রেম কোনো বিপণন-সংস্থার হয়ে কথা বলবে, এই সম্ভাব্যতা ও সেই স্পেস-এর দূর-উধাও শূন্যতা না-কাহিনীর যাদুকরী শোষণ-ক্ষমতাকেই প্রমাণ করে। এই ফাঁকা স্পেসটুকু, যা কিছুদিন পরেই ভরাট হয়ে উঠবে, বারবার ভাঙাচোরা কিন্তু পৌনঃপুনিক উল্লেখের মধ্যে কণিকার রিক্ত জীবনের সঙ্গে একধরনের সামীপ্য (এবং অনাগত ভবিষ্যতের নিরিখে একই সঙ্গে বৈপরীত্য-- বিপন ওঠার কোনো সম্ভাবনাই নেই) অর্জন করে ব'লে পৃথক স্বাতন্ত্র্যে আলাদা চরিত্র হয়ে ওঠে। সামনের আকাশের ওই ফাঁকা স্পেসে দেখা দেয় হাতুড়ি ও শব্দের লুকোচুরি, যা অতীতচারণার সঙ্গে সঙ্গে কণিকাকে প্রাণিতও করে। এইভাবে 'পরীবিদ্যা'য় টাইম, স্পেস ও ইনফিনিটির টুকরো টুকরো বিন্যাসের সমবায়ে গড়ে উঠেছে এক না-কাহিনীর জগৎ, যেখানে কণিকা বা তার কিশোরপুত্রকে নিয়ে তার সমস্যা গৌণ ব্যাপার; যেখানে ব্যক্তির সীমা পেরতে-চাওয়া অসীমের ব্যঞ্জনা; আকাশ-শব্দ-বিজ্ঞাপন-স্বপ্নদ্রষ্টা দাদা-উড়ন্ত পরী, ভোগবাদী অর্থনীতি ও তার ইতর প্রতিযোগিতা, রিক্ত নারীর ত্যাগের বৈপরীত্যে অবদমিত আকাঙ্খা সবকিছু একবিন্দুতে মিলে যায় এক বিচিত্র বৈপরীত্যের অন্বয়ে; বাহ্যত কোনো লজিকাল অন্বয়-সূত্র না থাকলেও! সবমিলিয়ে যে হাতছানি-দেওয়া এক জটিল প্রতিবেশকে আত্মস্থ করে নিতে পারে এই না-কাহিনী, যে-প্রতিবেশ আমাদের দৈনন্দিনতার সঙ্গে আচ্ছেদ্যভাবে আঠার মতো সেঁটে থাকে ; সেই প্রতিবেশ খুব চেনা হয়েও ঘোরতর অচেনা আমাদের। এই প্রতিবেশই তো চরিত্রের ব্যক্তিস্বরূপকে গড়ে তোলা, যেমন তুলেছে কণিকাকে। অপ্রাসঙ্গিক হলেও এড়ানো যায় না এই অনিবার্য প্রশ্ন 'ঘাটের কথা' 'না' বা 'বলাই'তে রবীন্দ্রনাথ কি আদৌ কোনো গল্প বলতে চেয়েছিলেন। অথচ সেই না-গল্পই তো প্রবাহিত সময়ের খন্ডমুহূর্তগুলিকে আত্মস্থ করে ধ্রুব আকাশের এক একটি তারা হয়ে আছে! 'পরীবিদ্যা' অতদূর যেতে পারবে কিনা তা এখনই বলা সম্ভব নয়, তবেআমাদের প্রাত্যহিক ছকবন্দী জীবনের ভয়াবহ গল্পহীনতাকেই তো এইভাবে না-কাহিনীর বিস্তৃততর ব্যাপ্তিতে শুষে নেওয়া সম্ভব! আখ্যানের বহুস্বারিকতা এখানে ভিন্ন তাৎপর্যে এসেছে-- চরিত্রপাত্র নয়, এখানে বহু বিচিত্র স্বরে কথা বলে উঠেছে আকাশ, তাকে বন্দী-করতে চাওয়া বিজ্ঞাপনের ফ্রেম, সেই ফ্রেম-এর নির্মাতা মজুর মানুষগুলি, ভিক্টোরিয়ার পরী, ভু কেঁচকানো পরশ্রীকাতর মধ্যবিত্তশ্রেণী এবং সর্বোপরি গভীর নৈঃশব্দ্য। কণিকা বা তার দাদার কিছু কথা আমরা শুনেছি বটে, তবে কণিকার তন্নিষ্ঠ পর্যবেক্ষণে প্রতিবেশের এই নিবিড় নৈঃশব্দ্যই এ' আখ্যানের সবচেয়ে বাত্ময় চরিত্র! এই তাৎপর্যেই ছড়ানো-ছেটানো চারপাশের প্রতিবেশকে বিপুলভাবে আত্মস্থ ক'রে 'পরীবিদ্যা'র না-কাহিনী প্রচলিত হ্যাঁ-কাহিনীর চেয়েও কোনো একটা জায়গায় জোরালো! তবে, আবার বলি, এই নিরীক্ষা সাধারণ পাঠকদের জন্যে নয়। আর, তথাকথিত বি-নির্মাণ প্রক্রিয়া যেহেতু আপেক্ষিত ও ধারণাসাপেক্ষ ব্যাপার, তাই একটা সাময়িক পরীক্ষার স্তরেই এসব লেখার যাবতীয় গ্রহণযোগ্যতা ও স্বচ্ছতা, ধারাবাহিক গল্পচর্চার ফর্মের এমন ভাঙন-মাদকের নেশা আমন্ত্রিত হওয়া উচিৎ নয়। যদি হয়, তাহলে আশঙ্কা অমূলক হবে না যে, 'কোলাজ'-এর এই গদ্যমালায় জনৈক সম্পাদককে যে চিঠি লিখেছিলেন সাধন চট্টোপাধ্যায় (এটিও একটি বিশুদ্ধ না-কাহিনী এবং ভারসাম্যহীন), তেমন অনেক চিঠি পাঠককে লিখতে হতে পারে-- গল্প বোঝানোর দায় মাথায় নিয়ে।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com